থ্রি মাস্কেটিয়ার্স

আলেকজান্ডার ডুমাস

আরমান কবির *অনূদিত*

পাবলিকেশন্স প্রিমিয়াম

উৎসর্গ

বন্ধুত্বের আখ্যান এই ঐতিহাসিক সাহিত্য আমার বাল্যবন্ধু
ইব্রাহিম-এর জন্য;

বন্ধু, হারিয়ে যাস না।

অনুবাদকের কথা

থ্রি মাস্কেটিয়ার্স পড়েনি এমন সাহিত্যপ্রেমী খুঁজে পাওয়া ভার। বিশ্বজুড়ে একাধিক ভাষায় অনূদিত বইটি সাহিত্যজগতে এক অনন্য সৃষ্টি। একাধিক বিশিষ্ট ও বাঘা অনুবাদক এর আগে বইটি অনুবাদ করেছেন বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। বলতে দ্বিধা নেই, প্রতিটি অনুবাদই একটি অপরটির চাইতে ভিন্ন ও অনন্য। গল্পের প্রয়োজনে বিশাল কলেবরের এ বইটি প্রতিবারই হয়েছে সংক্ষেপিত। তবে এতে সাহিত্যের রস বা গল্পের সৌন্দর্য এতটুকু কমেনি। মূল লেখকের কারিগরিও ফুটে উঠেছে সুচারুরূপে। আমার করা এই ভার্সনটিও একটি সংক্ষিপ্ত ভার্সন বলা যায়। তবে হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করেছি গল্পটিকে একটু ভিন্নভাবে বলার। আরও সুখপাঠ্য করে তোলার। কেননা, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বইটি যে সময়ে লেখা তখনকার ইংরেজির সাথে বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার রয়েছে অনেক পার্থক্য। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদটি সহজবোধ্য হয়ে ওঠে না। সেদিকটি মাথায় রেখে কিছু পরিমার্জন করতে হয়েছে।

আর এহেন কর্মে ভুলত্রুটি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কাজেই সেদিক থেকে আমাকে আপনারা একটু ছাড় দেবেন

বলেই আশা রাখি। আর হ্যাঁ, ভুলবেন না যেন—যে কাজ করে, ভুলও তারই হয়। হাতগুটিয়ে বসে থাকে যে, তার ভুল হওয়ার নয়।

—আরমান কবির

নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

থ্রি

মাস্কেটিয়ার্স

১.

ইতিহাস বলে, একসময় ইউরোপের রাজাদের নিজস্ব রক্ষীবাহিনী থাকা ছিল রীতিমতো বাধ্যতামূলক; এখন যেমন প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি সকলের নিজস্ব বডিগার্ড থাকে। তো ফ্রান্সের রাজার নিজস্ব রক্ষীবাহিনীর নাম ছিল মাস্কেটিয়ার্স। এই নামেই তাদের ডাকা হতো। তাদের কাজ ছিল রাজার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভীষণ ক্ষমতা দেওয়া হতো তাদের হাতে। রাজা ছাড়া কারও কাছে তাদের কৈফিয়ত দেওয়ার ছিল না। হামসে বড়া কওন—এই ছিল মাস্কেটিয়ারদের ভাবনা।

তো আমি বলছি ১৬২৬ সালের ফ্রান্সের রাজার মাস্কেটিয়ার বাহিনীর কিচ্ছা। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি থেকে দূরের এক গ্রাম। সেই গ্রাম থেকে এক যুবক রওনা হলো রাজধানীর উদ্দেশে। লক্ষ্য—মাস্কেটিয়ার বাহিনীতে যোগ দেওয়া। তা এমনি এমনি এই শখ জাগেনি তার মনে। ওর বাপ একসময় বেশ ডাকবুকো লোক ছিল। অর্থাভাবে এখন নুন আনতে পান্তা ফুরোয় বটে; কিন্তু একসময়ের বংশ গৌরব তার এখনো অটুট।

তো এই বাপই একদিন ছোকরাকে ডেকে বলল, 'তুই আমার একমাত্র সন্তান। তোকে নিজ হাতে অস্ত্র চালনা শিখিয়েছি। তলোয়ারে

তোর সামনে দাঁড়ায় এমন বান্দা কম আছে। কিন্তু এই অজপাড়াগাঁয়ে থেকে তোর ওই গুণের কদর হবে না। যা বলছি মন দিয়ে শোন!’

ছোকরা—নাম ওর দারতানিয়া—মনে মনে আন্দাজ করে ফেলেছে বাপ কী বলতে চায়।

‘রাজধানীতে যাবি বাবা তুই। রাজার নিরাপত্তার ভার যাদের ওপর সেই মাস্কেটিয়ার দল তোকে পেলে লুফে নেবে। তাছাড়া আমার দোস্ত ত্রেভিয়ে ওই দলের মাথা। একটি চিঠি লিখি দেবো আমি। চিঠিটি ওর হাতে নিয়ে দিলেই কাজ ফর্সা।’

‘সত্যি বলছ বাবা, নেবে ওরা আমায়?’ সদ্য কৈশোর পেরোনো দারতানিয়ার চোখ-মুখে স্বপ্ন আর গৌরব ছায়া ফেলে।

‘তোর মতো কবজির জোর আর তাগদ আর কজনের আছে রে ব্যাটা! ভুলে গেলে চলবে কেন তুই গাস্কন। নেবে মানে আলবৎ নেবে। মনে রাখবি, কখনো কোনো লড়াই থেকে পিছু হটবি না। সাহস রাখবি বুকে। এই নে আমার সম্বল কিছু টাকা তোর হাতে দিলাম। যা বেরিয়ে পড়!’

বাপের দেওয়া কিছু টাকা আর একটি তরবারি সম্বল করে বেরিয়ে পড়ল দারতানিয়া। সঙ্গী হলো হাড় জিরজিরে একটি টাট্টু ঘোড়া। হলদে হয়ে আসা গায়ের রং আর লোম ওঠা শরীরে ঘোড়া বলে চেনাই দায়। তবু এটাই দারতানিয়ার বাহন।

আর এই ঘোড়াই হলো ওর কাল।

ভাগ্যের সন্ধানে চলতে চলতে এসে পৌঁছল মিউং শহরে। রাজধানী প্যারি তখনও খুব কাছে বলা যাবে না।

দারতানিয়া তখন পথযাত্রায় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। চোখ খুঁজে ফিরছে একটা হোটেল বা এ জাতীয় কিছু। মিউং শহরে ঢোকার পর থেকে একটা জিনিস খেয়াল করে অবাক হচ্ছিল দারতানিয়া। এই সাত সকালে রাস্তার লোকজন সব ওর দিকে চেয়ে কেন যেন মুখ টিপে হাসছে। হতে পারে ওর গায়ের মলিন পোশাক। শহুরে মানুষের রুচির সাথে বড্ড বেমানান। দারতানিয়ার চেহারাটা ভালো বলতে হবে। কাজেই ওর মলিন পোশাক ছাপিয়ে দৃঢ় চোয়াল আর কুচকুচে কালো চোখ মানুষের নজর কেড়ে নিচ্ছে হয়তো। ভাবল ও। কিন্তু হাসবে কেন!

সে যাই হোক।

পথচারীদের হাসির পরোয়া না করে নির্বিঘ্নে দারতানিয়া এসে পৌঁছল জলি মিলার সরাইখানায়। একটি গাছের নিচে ঘোড়াটাকে বাঁধছিল দারতানিয়া একমনে। এ সময় ওর পেছন থেকে কারা যেন অট্টহাসি হেসে উঠল।

দপ করে মাথায় আগুন জ্বলে উঠলেও ধীরে ধীরে পিছু ফিরল ও।

ওর ঠিক পেছনে সরাইখানার নিচতলার জানালা। আর তার সামনেই চেয়ার পেতে বসে আছে জোয়ান তিনেক লোক। পোশাক-আশাকে বলে এলেবেলে কেউ নয়। কিন্তু...

দারতানিয়া পেছন ফিরতেই ওরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আবারও হেসে উঠল। একজন আবার আঙুল দিয়ে ওর ঘোড়ার দিকেই দেখাচ্ছিল।

চোখ সরু করে কিছুক্ষণ দেখল দারতানিয়া। জানালার ঠিক সামনেই যে বসে আছে নেতাগোছের লোকটা, বেশ যত্ন করে ছাটা একটুকরো

গোঁফ আর লম্বা চোখা নাক। চেহারায় আশ্চর্য কাঠিন্য। কিন্তু দারতানিয়া এসব থোরাই পরোয়া করে।

‘মাফ করবেন স্যার, আমি কি জানতে পারি আপনাদের হাসির কারণ কী?’ দুই পা সামনে বেড়ে একহাত কোমরে রেখেছে দারতানিয়া।

দামি পোশাক আর বাহারি গোঁফ সমেত ভদ্রলোক যেন শুনতে পায়নি। পাশের সঙ্গীদের ইঙ্গিতে ঘোড়াটি দেখিয়ে আরেক চোট হাসল।

‘এই যে শুনতে পাচ্ছেন না? বলি, আমার মধ্যে হাসির কী দেখলেন?’ গলার স্বর এক পর্দা উঁচু করল দারতানিয়া।

‘আপনি কি আমাকে বলছেন?’ বেশ মার্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে সরাইখানার আগন্তুক।

‘আর নয়তো কাকে? বলুন হাসছেন কেন? আমিও হাসি একটু।’

‘কিন্তু আমরা তো আপনার সাথে কথা বলছি না। নিজেরাই কথা বলছিলাম।’

‘কিন্তু আমি ঠিক আপনাকেই বলছি।’

আগন্তুক এবার খানিকক্ষণ দারতানিয়ার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে লটকে আছে মিচকে হাসি।

মেপে মেপে পা ফেলে এবার সরাইখানার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে সে। দারতানিয়ার চাইতে হয়তো এক-দুই কদম দূরে।

‘আসলে ও রকম রংয়ের ঘোড়া হতে পারে, সেই ধারণা ছিল না আমাদের বুঝলেন! তাই ভীষণ অবাক হচ্ছিলাম যে ওটা আদৌ ঘোড়া কিনা।’ এই কথায় সরাইখানার ভেতর থাকা দুজন আরও জোরে হেসে উঠল।

‘একটা নিরীহ অবলা জীব নিয়ে যে মানুষ হাসি-ঠাট্টা করতে পারে, বোঝাই যাচ্ছে ঘোড়ার মালিক নিয়ে কথা বলার মুরোদ তার নেই।’ গলায় যেন আজ তরবারির ধার দারতানিয়ার।

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না ভদ্রলোকের। এই ছোকরা বলে কী? পাগল না তো?

‘এই যে জনাব, মুখ সামলে।’ একটা ভুরু উঁচু করে যেন সাবধান করতে চাইল আগন্তুক।

কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল আগন্তুক। কিন্তু এত সহজে কি আর একজন গাস্কন হার মানে? উঁহু, কখনোই নয়।

‘দাঁড়ান দাঁড়ান মশাই। চললেন কোথায়! এর একটা বিহিত করে যান!’ তলোয়ারে হাত রেখেছে দারতানিয়া। এক্ষুনি টেনে বের করে আনবে যেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে আগন্তুক দেখল ছোকরার হাত তরবারিতে, ‘ওতে হাত দিচ্ছেন যে! মারবেন নাকি?’ অবজ্ঞার সুর তার কণ্ঠে।

‘পেছন থেকে আমি কাউকে মারি না। নাকি আপনাকে তা-ই করতে বলছেন?’

দপ করে যেন চোখ দুটো জ্বলে উঠল আগন্তুকের, এই ছোকরা বলে কী! সোহবত শেখানো দরকার তো একে।

‘অত মারামারির শখ থাকলে এখানে কী ভায়া। যাও না রাজার রক্ষী দলে গিয়ে ভেরো গে, যাও।’ মুখ ভেংচে তিক্ত স্বরে বলল আগন্তুক।

মারার উদ্দেশ্যে নয়, হয়তো শুধু ভয় দেখাতেই আচমকা একটানে তরবারি বের করে প্রচণ্ড এক আঘাত করে বসল দারতানিয়া। ভাগ্য ভালো আগন্তুক সতর্ক ছিল। এক লাফে সময়মতো সরে যেতে পারল। নয়তো কী হতো বলা যায় না।

কিন্তু এরপরই যেন নরক নেমে এলো দারতানিয়ার ওপর।

ঝড়ের বেগে ঘটনাস্থলে হাজির হলো জনা কয়েক লোক। হাতে অস্ত্রশস্ত্র। বৃষ্টির মতো এলোপাতারি আঘাত পড়তে লাগল অপরিণামদর্শী দারতানিয়ার ওপর। মুহূর্তে দু-টুকরো তরবারি সমেত নিজের রক্তের পুকুরে মুখথুবড়ে পড়ল বেচারা। অনড়।

উচিত শিক্ষা হয়েছে, ভাবে আগন্তুক।